



কোনো কাজই ঠিকমত হচ্ছে না আজ। সব কিছুতেই কিছু না কিছু বামেলা তৈরি হচ্ছে।

বামেলার শুরু হয়েছিল যশুয়াকে না পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এর আগে সব কাজেই যশুয়া আমার সঙ্গী হতো। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি আমরা দুজনে একসাথে। কাজেই, পরিষ্কারভাবে দুজন দুজনকে বুঝতে পারি। যশুয়ার বুড়ি মা সিঁড়ি থেকে পড়ে পা মচকেছে বলে হট করে যশুয়া চলে গেছে ন্যাশভিলে। কবে ফিরবে তার কোন হাদিস নেই। এদিকে আমার ট্যাকের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ। কিছু একটা না করলে দিন চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। ফলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ামি বীচের মাঝারি মাপের মাফিয়া নেতা মরিতোর কাছে হাত পাততে হয়েছিল। মরিতো তার দলের একজনকে দিয়েছিল আমার আজকের অপারেশনের জন্য।

ছুঁচোর মতো চেহারার এক অল্প বয়েসী ইটালিয়ান ছেলে। নাম কন্টি। মরিতো বলেছিল দারুণ চালু নাকি ছোকরা। এই দারুণ চালু ছোকরাই আজ আমাকে ডুবিয়ে ছেড়েছে। আর সে কারণেই প্রাণ বাঁচাতে এখন ইঁদুরের মত টার্নপাইক ধরে উভরমুখে ছুটছি আমরা।

সন্ধ্যাবেলায় দুজনে মুখোশ পরে পিস্তল হাতে চুকে পড়েছিলাম মিরামার টাউন সেন্টার প্লাজার ব্যাংক অব আমেরিকার শাখায়। এ ধরনের অপারেশন সাধারণত খুব সোজা হয়ে থাকে। অন্ত বাগিয়ে ধরলেই ব্যাংক টেলাররা কোন প্রতিবাদ না করে নিজেরাই ক্যাশ বাঞ্ছ খুলে সব টাকা দিয়ে দেয়। ওভাবেই ব্যাংকগুলো টেইন করেছে তাদেরকে। টাকার চেয়ে প্রাণের মূল্য নাকি বেশি।

আজকেই শুধু ব্যতিক্রম হলো। এক অল্প বয়েসী ছোকরা টেলার ছিল একপাশের কাউন্টারে। কিছু বুঝে উঠার আগেই

হট করে সে পানির বোতল তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে দিল ব্যাংকের সামনের কাঁচের দিকে। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে কন্টি ছেলেটার কাঁধ বরাবর গুলি চালিয়ে দিল এই অপরাধে। ওর পিস্তল যে গুলিভরা সেটাই জানা ছিল না আমার। আমার আর যশুয়ার পিস্তলে কোনো গুলি থাকে না। থাকার প্রয়োজনই পড়েনি আসলে কখনো। ডাকাতি আর খুন জথম এক জিনিস নয়।

গুলি খেয়ে ছেলেটা পড়ে যেতেই দ্রুত সিন্ধান্ত নিলাম আমি। কেঁচে গেছে সবকিছু। বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে এখনই। দরজা দিয়ে বের হতে গিয়েই চোখে পড়লো পুলিশের গাড়িটো। পাশের দোকানটা স্টারবাক কফির। কফি থেকে সেখানে এসেছিল এক পুলিশ অফিসার। পুলিশের গাড়ি দেখেই টেলার ছোকরাটা অত্থানি সাহসী হয়ে উঠেছিল। পুলিশের মনোযোগ আর্কর্ষণের জন্য বোতল ছুড়ে মেরেছিল কাঁচে। ছেলেটার বুদ্ধি কাজে লেগেছে। শব্দ শুনেই গাড়ি থেকে নেমে এদিকে এগিয়ে আসছে অফিসারটি। সতর্ক। অভিজ্ঞ চোখে গোলমালের আভাস পেয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল চলে এসেছে তার হাতে।

চাপা গলায় কন্টিকে বললাম, ‘বাইরে পুলিশ। পালাচ্ছ আমরা’।

দরজার কাছে জড়ো হওয়া ভীত সন্ত্রস্ত কাস্টমারদের মধ্য থেকে সবুজ রঙ এর টপস এবং লাল স্কার্ট পরা একটা মেয়েকে খপ করে ধরে হেঁচকা টানে আমার বুকের সামনে নিয়ে নিলাম আমি। মেয়েটার আতঙ্কিত চিংকার উপেক্ষা করে তাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে দরজা দিয়ে বের হয়ে আসি আমরা। মেয়েটার গলায় ঠেকানো পিস্তল দেখেই ডানপাশে কাত হয়ে হাতের অন্ত মাটিতে ফেলে দেয় অফিসারটি। দুই হাত দুইপাশে ছাড়িয়ে দিয়ে নরম স্বরে বলে, ‘ওর কোন ক্ষতি

করো না। ছেড়ে দাও ওকে। এই দেখো আমি নিরস্ত।’

আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই ভীত কণ্ঠি গুলি করে বসে তাকে। দড়াম করে মাটিতে পড়ে যায় অফিসারটি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। কোথায় গুলি লেগেছে কে জানে। মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে আমার। আমার পিস্তলে গুলিভরা থাকলে আমি একবিন্দু দিখা করতাম না এই গর্ভভটাকে মেরে ফেলতে। কিছু করার নেই এখন। মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির কাছে নিয়ে দরজা খুলে ব্যাকসিটে বসিয়ে দিই আমি। কণ্ঠি দ্রুত তার পাশে গিয়ে বসে পড়ে। আমি ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিই। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে রেড রোড দিয়ে টার্নপাইক নর্থে উঠে পড়ি আমরা। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে দেখি মেয়েটার দিকে অস্ত্র বাগিয়ে বসে আছে কণ্ঠি। হাত কাঁপছে থরথর করে। ট্রিগারের উপর আঙুলটা শক্ত হয়ে বসে আছে। ব্যাংকের উত্তেজনার ছাপ পড়েছে তার সারা শরীরে। দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে উঠি আমি, ‘খবরদার, পুলিশটার মত একেও যেন আবার গুলি করে বসো না, উল্লুকা পাঠাঠা’।

মুখোশ পরে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাশের লেনের গাড়ি থেকে লোকজন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। একজনকে দেখলাম সেলফোন কানে উঠাচ্ছে। নিচ্যাই পুলিশকে কল করছে। যে কোন সময় পুলিশের হেলিকপ্টার এসে যেতে পারে কিংবা রোড রুক হতে পারে। আমি টার্নপাইক থেকে চট করে সানরাইজ বুলেভার্ড ওয়েস্টে এক্সিট নিয়ে নেই। পশ্চিম দিকে কিছুদূর যাবার পরে বেশ নিরবিলি একটা এলাকায় চলে আসি। সানরাইজ বুলেভার্ড ছেড়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে আবাসিক এলাকায় চুকে পড়ি আমি। ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে থাকি। দ্রুষ্টি দুই পাশের বাড়িগুলোর দিকে। একটা বাড়ির সামনে সংবাদপত্রের স্তুপ জমে আছে। তার মানে এই বাড়িতে আপাতত কেউ নেই। ওই বাড়ির ড্রাইভ ওয়েতে নিয়ে আসি গাড়িটাকে আমি। তালা ভেঙে ঘরে চুকতে তিরিশ সেকেণ্ড লাগে না আমার। গারাজ খুলে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিই সেখানে। এখন নিরাপদ। আপাতত কেউ টের পাচ্ছে না যে আমরা কোথায় আছি। ঠাণ্ডা মাথায় এখন পরবর্তী কার্যক্রম চিত্তাভাবনা করতে হবে।

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকানোর সময় পাই আমি। লিভিং রুমে একটা সোফায় বসিয়েছে কণ্ঠি তাকে। কোথা থেকে নাইলনের দড়ি জোগাড় করে দুই হাত পিছনে নিয়ে বেঁধে রেখেছে। পূর্ব ভারতীয় চেহারা মেয়েটার। প্রথম দেখায় যতটা কম বয়েসী মনে হয়েছিল ততটা কম বয়েসী নয় সে। মধ্য তিরিশের হবে বলে মনে হচ্ছে। আহামরি কোন সুন্দরী নয়, কিন্তু কোথায় যেন একটা বুনো আকর্ষণ আছে। ভরাট শরীর। যৌবন যেন মেয়েটার অজান্তেই তার সারা শরীরে বাসা বেঁধেছে। যে কোন পুরুষই দ্বিতীয়বার ঘুরে

তাকিয়ে দেখবে এই মেয়েকে। কুচকুচে কালো রেশের মত মখমলে চুলগুলো ছাড়িয়ে আছে দুই কাঁধের উপর। ডাগর চোখে এক ধরনের কিশোরীসূলভ সারল্য রয়েছে। সে-কারণেই বয়সের তুলনায় অনেক কমবয়েসী মনে হয় প্রথম দেখাতে। দুনিয়ার কোন ঘোরপ্যাঁচ যে এই মেয়ে দেখে নি সেটা বোৰা যায় তার চেহারা দেখলেই।

আচমকা ঘটনার রেশ এখনো কাটেনি মেয়েটির। হতবিহবল দেখাচ্ছে তাকে। আচরণে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করছে। সরল চোখ দুটোয় ভয়ের ছাপ পড়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বিস্ফীরিত হয়ে আছে সেগুলো। আমাকে তার দিকে তাকাতে দেখেই হড়হড় করে কথা বলে উঠে মেয়েটি, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ। আমি তোমাদের কথা কাউকে বলবো না, প্রামিজ করছি’।

‘চোপ! একদম কোনো কথা না’। কর্কশ স্বরে ধমকে উঠি আমি। ‘সময় হলেই ছাড়া পাবে’।

‘তার মানে, তার মানে তোমরা আমাকে আটকে রাখছো, জিম্মি করছো?’ ভয়ে তোতলাতে থাকে মেয়েটা।

উন্নত দেবার প্রয়োজন বোধ করি না আমি। মেয়েটার পাশে রাখা ছেট পাসটা তুলে নেই। মেয়েলি ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে ভর্তি সেটা। গোটা কয়েক দশ ডলারের নোট আর সামান্য কিছু খুচরো পয়সাও রয়েছে সেখানে। প্লাস্টিকের কার্ডগুলো সুন্দর করে সাজানো। আমি ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তুলে নেই সেখান থেকে।

ক্যাটলিনা রামিরেজ, জন্য ১৯৭৩, ঠিকানাঃ ১৫৫৫১ ফ্লেনকেয়ার্ন রোড, মায়ামি লেকস।

যদিও চেহারাটা পূর্ব ভারতীয়দের মত, মেয়েটা কিন্তু পূর্ব ভারতীয় নয়। ল্যাটিনো। দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কার্ডটা পার্সে ভরে সেটাকে আমি ছুড়ে দিই মেয়েটার কোলে।

‘প্লিজ, ছেড়ে দাও আমাকে। আমিতো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নাই।’ আবারো মিনতি করতে থাকে মেয়েটা। তার কার্কুতমিমূর্তিকে উপেক্ষা করি আমি। কণ্ঠিকে মেয়েটার কাছে রেখে উপরতলায় কী আছে দেখার জন্য আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে যাই। উপরতলা পুরোটা দেখা শেষ করে সিঁড়ির গেঁড়ায় ফিরে আসতেই একেবারে বরফের মত জমে যাই আমি।

কণ্ঠি বলছে, ‘তুমি আমাকে যত টাকার লোভই দেখাও না কেন নাইফ নিকোলোর অনুমতি ছাড়া আমি তোমাকে ছাড়তে

পারবো না কিছুতেই’।

আমাকে সিঁড়ির গোড়ায় দেখে মেয়েটাও জমে গেছে। তীব্র আতঙ্ক এসে জমা হয়েছে তার বড় বড় দুই চেখে। যতটা বোকাসোকা ভেবেছিলাম মেয়েটাকে আমি ততটা বোকাসোকা মেয়ে নয় সে। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে মাথায়। অন্তত কস্টির মত মাথামোটা গর্ভত নয়। আমার নামটা জেনে ফেলার ক্ষতিকর দিকটা ঠিকই বুবাতে পেরেছে সে।

আমার জমে যাওয়া চেহারা দেখেই হড়হড় করে কথা বলতে থাকে কন্টি। ‘বস, আমাকে অনেক টাকার লোভ দেখাচ্ছিল এই মেয়েটা। ওকে ছেড়ে দিতে বলছিল। কিন্তু আমি বলেছি তোমার অনুমতি ছাড়া সেটা আমি করতে পারবো না’।

সিঁড়ির গোড়া থেকে নিচে নেমে আসি। ‘আমার নাম বললে কেনো ওকে? যেন কিছু হয় নি এমন ভঙ্গিতে বলি আমি। ‘আমার কোন দোষ নাই, বস। ইচ্ছা করে বলি নাই। এই মেয়েটা মহা ঘোড়েল, আস্ত পেজগি একটা। কথার প্যাংচে ফেলে আমার মাথা আউলা করে দিয়েছিল। মাফ করে দেন, বস।’ বড় করে নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। কাজ বেড়ে গেলো অনেক আমার। সেই সাথে বামেলাও। তিক্তায় ছেয়ে গেল মনটা। গাধাদের নিয়ে কাজ করতে গেলে এরকমই হয়।

কস্টির কাধে হাত রাখলাম আমি। ‘ঠিক আছে। অনেক বামেলা গেছে আমাদের উপর দিয়ে। এটা হতেই পারে। কোনো ব্যাপার না। উপরে বেডরুম আছে। যাও একটু রেস্ট নিয়ে এসো’।

কন্টি কোন উচ্চবাচ্য করলো না। বাধ্য ছেলের মতই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলো। ওর সাথে সাথে যে আমিও উপরে উঠছি সেটা দেখলেও, এর মর্ম হয়তো বুবাতে পারছে না সে। উপরে উঠে একটা বেডরুমে ঢুকে গেলো সে। সাথে সাথে আমিও। আমার দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করেছে কন্টি। যাদুমন্ত্রের মতো নিমেষে আমার হাতে চলে এলো ছয় ইঞ্চি রেডের ছুরিটা। বাটের মধ্যে রয়েছে ফলাটা। বাটের উপরে ছোট একটা বোতামে চাপ দিতে ফলাটা বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে। বিদ্যুৎ গতিতে একহাতে কস্টির মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে ঠিক ডান পাশের কিডনি বরাবর গেথে দিলাম সেটা আমি। কখন দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলো কন্টি তা হয়তো সে নিজেও জানে না। সাধে কি আর লোকে আমাকে নাইফ নিকোলো বলে ডাকে। কন্টির কাপড়েই মুছে নেই ছুরিটা আমি। তারপর বোতাম টিপে ফলাটাকে বাটের ভিতরে ভরে ফেলি। পকেটে পুরে নেই।

ছুরিটাকে স্যান্ডে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি আমি। লিভিং রুমে এসে মুখ থেকে মুখোশ খুলে নেই। এর আর কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে মুখোশ খুলতে দেখে আতঙ্কটা আরো বাড়লো মেয়েটার। ভয় জড়ানো গলায় হড়বড় করে কথা শুরু করলো সে, ‘পিল্জ, আমাকে ছেড়ে দাও, পিল্জ। আমাকে আটকে রেখে কোনো লাভ হবে না তোমাদের। কেউ আমার জন্য কোনো মুক্তিপণ দেবে না তোমাদের। আমি সিঙ্গল মম। ছোট একটা বাচ্চা আছে আমার। বাচ্চাটার কথা ভেবে হলেও ছেড়ে দাও আমাকে। আমি না থাকলে ও যে এতিম হয়ে যাবে’।

আমি ওর সামনের সোফায় বসতে বসতে জিজেস করলাম, ‘

তোমার বাচ্চা এখন কোথায়?’

‘বাড়িতেই, ওর নানির কাছে। আমার মা থাকে আমার সাথে। ‘আমাকে মেরো না পিল্জ’। আবারো কাতর মিনতি জানায় মেয়েটা।

‘ঠাণ্ডা হও। কে বললো তোমাকে আমি মারবো? মেরে ফেলে লাভ কী আমার? খামোখা বামেলায় জড়াতে যাবো কেন আমি?’ আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো মেয়েটা। তারপর গলা নামিয়ে নিচু কঞ্চে বলে, ‘আমি জানি তুমি আমাকে মেরে ফেলবে’।

কেন মনে হচ্ছে যে তোমাকে আমি মেরে ফেলবো? আমি ব্যাংক ডাকাত, কিন্তু খুনি নই। খুন খারাবি অনেক বামেলার কাজ, মেলা বিপদ এতে’। অলস ভঙ্গিতে বলি আমি।

‘তোমার নাম জানি আমি। তোমার বন্ধু মুখ ফসকে বলে বলেছে। তুমি মুখোশ খুলে ফেলেছো। তোমার চেহারা দেখে ফেলেছি আমি। কিন্তু তা নিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। এর মানেই হচ্ছে, তুমি আমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো’। আরো নিচু হয়ে গেছে মেয়েটার কঞ্চ।

আমি বেশ কৌতুক অনুভব করি মেয়েটার কথায়। নাহ, বেশ ভালই বুদ্ধি আছে দেখছি ওর মাথায়।

‘আমাকে মেরেতো তোমার কোনো লাভ নেই। কেন খামোখা মারবে আমাকে?’ প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় মেয়েটা বলে।

‘সেটাইতো বলছি আমি। তোমাকে মেরে লাভটা কী আমার?’  
কৌতুকের স্বরে বলি আমি।

আমার কৌতুক করাকে উপেক্ষা করে যায় মেয়েটা। স্কুলের কোনো ছাত্রকে শিক্ষিকা যে রকম করে বোকায় সেই ঢং এ বলতে থাকে সে, ‘আসলেই কোনো লাভ নেই তোমার। তুমি ভাবছো তোমার নাম জানি আমি, চেহারা দেখে ফেলেছি। এখন আমি তোমার জন্য মারাত্মক হ্রাসক্ষরণ। কাজেই, আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি তোমারা এমনিতেও পুলিশের হাত এড়াতে পারবে না। পারতে, যদি না তোমার নির্বোধ বন্ধুটা পুলিশকে গুলি করতো। পুলিশকে গুলি করে কেউ কখনো পার পায়নি। যেখানেই যাও না কেন ঠিকই খুঁজে বের করবে তারা তোমাদের। তোমাদের গাড়ির লাইসেন্স প্লেট কেউ না কেউ দেখেছে’।

আমি মুখে হাসি বুলিয়ে রেখেছি। যেন অবুবা কোন শিশুর গল্প শুনছি। গাড়িটা ছুরি করা। নিজের গাড়ি নিয়ে অপারেশনে যাবো, এমন বোকা আমি নই। মেয়েটা খামোখাই ধূমজাল ছড়াবার চেষ্টা করছে। তবে পুলিশকে গুলি করাটা আসলেই বোকামি হয়েছে। পুলিশ ব্যাটা যদি মরে গিয়ে থাকে তবেতো আর কথাই নেই। লেজ গুটিয়ে আমেরিকা ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না আমার।

বেশি কথা হয়েছে। পুলিশ ব্যাটা যদি মরে গিয়ে থাকে তবেতো আর কথাই নেই। লেজ গুটিয়ে আমেরিকা ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না আমার।

মনে হলো আমার ভাবনাগুলোকে ধরে ফেলেছে মেয়েটা। বলতে থাকলো সে, ‘গাড়িটা হয়তো ছুরি করা। সেক্ষেত্রেও রেহাই নেই

তোমাদের। যেখান থেকে চুরি গিয়েছে সেখানকার প্রতিটা ইঞ্জিন জায়গা, প্রতিটা সূত্রকে বিশ্লেষণ করবে পুলিশ’।

আমি তো ডুবেছিই সুন্দরী। তোমাকে নিয়েই না হয় আরেকটু ডুবলাম’। বিদ্রূপ করলাম আমি।

আমার বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে গেল মেয়েটা। স্কুল শিক্ষিকার মত এখনো বোঝাচ্ছে আমাকে।

দোকানের গোলাগুলি থেকে অল্পতেই হয়তো পার পেয়ে যাবে তোমরা। কারণ ওগুলো পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। যা ঘটেছে উত্তেজনার তোড়ে ঘটেছে। হিট অব দ্য মোমেন্ট। আমাকে এখন মারলে, এটা হবে ঠাণ্ডা মাথার খুন। ফাস্ট ডিগ্রি অপরাধ। ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমার’।

হো হো করে হেসে উঠি আমি। ‘না হয় ঝুললামই ফাঁসিতে একবার। সবকিছুই অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। কি বলো?’ টেবিলের উপর দুই পা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে বসি আমি। মজাই লাগছে মেয়েটার রেঁচে থাকার আকৃতা দেখে।

আমার নিস্পত্তি আচরণ দেখেই হয়তো একেবারে ভেঙে পড়ে মেয়েটা। ফুরিয়ে কেঁদে উঠে সে। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠেছে তার ভরাট শরীর। হাত দুটো পিছনে বাঁধার কারণে বক্ষপ্রদেশ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি উঁচু হয়ে আছে। শরীরের কাঁপুন ওখানেও চেউ আকারে সংক্ষারিত হয়েছে। মনে মনে একটু আফসোসই জাগে আমার। বিপদের এত বেশি বুঁকি না থাকলে একটু আনন্দ স্ফূর্তি করা যেত। অনেকদিন ধরেই নারীসঙ্গ বাধিত আমি।

কঠে সমস্ত আঁকুতি নিয়ে ধরা গলায় মেয়েটা বলে, ‘পিল্জ আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না, আমার বাচ্চাটার কথা একটু ভাবো। মাকে ছাড়া যে ও রাতে ঘুমোতেই পারে না’।

কোনো ভাবাত্তর ঘটে না আমার। নির্লজ্জের মত নির্বিকার তাকিয়ে থাকি মেয়েটার সুউচ্চ বুকের দিকে।

কান্নার কারণেই হয়তো হঠাৎ করে প্রচঙ্গভাবে হেঁচকি তুলতে থাকে মেয়েটা। ‘গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু ড্রিঙ্কস দেবে, পিল্জ।’ শ্বাসকষ্টের রোগীর মত টেনে টেনে বলে মেয়েটা আমাকে।

আমার নিজেরও তেষ্টা পেয়েছে। ধৰকলতো আর কম যায় নি সেই সঙ্গে থেকে। সোফা থেকে উঠে দাঢ়াই আমি। কিচেনে যাই। ছোটোখাটো একটা বার কেবিনেট রয়েছে সেখানে। সেটার দরজা খুলতে মনটা আনন্দে ভরে উঠে আমার। পুরোটাই ভর্তি নানান ধরনের পানীয় দিয়ে। হইস্কি, রাম, টাকিলা, ব্রাস্টি, শ্যাম্পেন দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে এর মালিক। লোকটার রুচি আছে বলতে হবে। খুশিতে ছোট করে একটা শিষ দিই আমি। ওখান থেকেই জিজেস করি, ‘কী চাও তুমি, শ্যাম্পেন, নাকি ওয়াইন? ড্রিংকের কোনো অভাব নেই এই বাড়িতে’।

ব্রাস্টি থাকলে ওটা দাও একটু। নো আইস, পিল্জ’। হেঁচকি টানতে টানতে মেয়েটা বলে।

একটা গ্লাসে ব্রাস্টি ঢালি আমি। অন্য একটা গ্লাসে টাকিলা নেই আমার জন্য। ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে টাকিলাতে মেশাই।

তারপর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে আসি লিভিং রুমে। হইস্কির গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে সোফায় হেলান দিয়ে বসে

টাকিলায় চুমুক দিই আমি। আরামের একটা আবেশ গলা বেয়ে নেমে যায় আমার। ফুরফুরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে।

‘দয়া করে হাতের বাঁধনটা খুলে দেবে আমার। হাত বাঁধা থাকলে থাবো কী করে?’ আদুরের স্বরে মেয়েটা বলে। কথা শুনে ওর দিকে তাকাই আমি।

‘রক্ত চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে আমার হাতে। তোমার বন্ধুটা খুবই নির্মূল। একটা মেয়েকে কেউ এরকম শক্তভাবে বাঁধে?’ ছেলেমানুষের মত ক কন্টির বিরুদ্ধে আমার কাছে নালিশ জানায় মেয়েটা।

সোফা থেকে উঠে গিয়ে মেয়েটার পিছনে যাই আমি। সত্যি সত্যি প্রচণ্ড শক্তভাবে বেঁধেছে কন্টি মেয়েটার হাত দুটো। কজির কাছে শক্ত হয়ে বসে আছে বাঁধনটা। গিট খুলে বাঁধনটাকে খুলে দিই আমি। তারপর আবার সোফায় বসে টাকিলার গ্লাস তুলে নিই হাতে।

বাঁধনমুক্ত হাত দুটোকে সামনে নিয়ে আসে মেয়েটা। কজির কাছটাতে গভীর লাল দাগ পড়ে গিয়েছে দুহাতে। একবার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতকে, আবার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতকে ডলছে। রক্ত চলাচলকে ঠিক করছে। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমার দিকে হাত দুটোকে বাড়িয়ে দেয় সে। অভিমানভরা কঠে বলে, ‘দেখছো তোমার বন্ধু কী দশা করেছে আমার হাতের? ওকে বলবে কোন মেয়েকে যেন এরকম করে আর না বাঁধে। মেয়েদের শরীর অনেক নরম, এটা ওকে বুবাতে হবে’।

মেয়েটা এমনভাবে কথা বলছে আমার সাথে যেন কত জনমের পরিচয় আমাদের। ওকে খরচের খাতায় ফেলে দিতে হবে বলে মনে মনে দুঃখেই লাগছে আমার। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি পেশাদার লোক। এই সব আবেগকে পাত্তা দিতে নেই, সেটা আমার দীর্ঘ পেশাদার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুবোছি। আমার এই লাইনে ভুল করার কোন সুযোগ নেই। সামান্য একটু ভুলের মাশুল বিরাট হয়ে দাঁড়ায় এখানে। কন্টিই তার জ্ঞান প্রমাণ।

হাত টেপা বন্ধ কও টেবিল থেকে ব্রাস্টির গ্লাসটা তুলে নেয় মেয়েটা। চুমুক দেয় তাতে। তাড়াহুড়ের কারণেই হয়তো গলায় আটকে যায় তা। শরীর বাঁকা করে প্রবলভাবে খক খক করে কেশে উঠে সে। আবারো হেঁচকি শুরু হয়ে যায় তার। কাশির দমকে শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে মেয়েটার। টাকিলা হাতে নিয়ে সোফায় সোজা হয়ে বসি আমি। তাকিয়ে আছি মেয়েটার দিকে। কাশি সামাল দিতে না পেরে সামনের দিকে ঝুঁকে আসে মেয়েটা। হাতে ধৰাব্রান্ডির গ্লাসটা কাত হয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে গড়িয়ে পড়বে মেবোতে। মেয়েটার হাত থেকে ব্রাস্টির গ্লাসটা নেবার জন্য সামান্য ঝুঁকে আসি আমি। মেয়েটার শরীরটা আরো কাত হতে থাকে। আমি হাত বাড়িয়ে দিই মেয়েটার হাত থেকে গ্লাসটা ধৰার জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্থির হয়ে যায় মেয়েটার শরীর। কিছু বুবো উঠার আগে পুরো গ্লাসের ব্রাস্টি আমার চোখের দিকে সজোরে ছুড়ে মারে সে। নির্জলা ব্রাস্টি চোখে পড়তেই চোখের মধ্যে আগুন ধরে যায় আমার। টাকিলার গ্লাসটা ছেড়ে দিয়ে আর্টনাদ করে দুইহাত

চেপে ধরি আমি। প্রচঙ্গ ভারি কিছু এসে প্রবলবেগে আঘাত করে মাথায়। কিছু বুঝে উঠার আগেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায় আমার।

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরেছে জানি না। মাথাটা টন্টন করছে। হাত দিয়ে মাথা ছুঁতে গিয়ে টের পাই, কেউ খুব শক্ত করে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে আমাকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুবাতে পারি, শুধু হাত নয়, পা দুটোকেও বেঁধে রেখেছে সোফার পায়ার সাথে। ধীরে ধীরে চোখ খুলি আমি। তৈর আলোয় প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না আমার। কিছুক্ষণ পিটপিট করার পরে সবকিছু দৃশ্যমান হয়। আয়েসী ভঙ্গিতে হিস্পানিক মেয়েটা বসে আছে সোফায়। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমাকে জ্ঞান ফিরতে দেখেই মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠে তার পাতলা ঠোঁটে। আমার ছুরিটা বের করে নিয়েছে মেয়েটা পকেট থেকে।

টেবিলের উপরে আমার আয়তের বাইরে পড়ে রয়েছে সেটা।

মেরেতে একটা চিনামটির ফুলদানি পড়ে রয়েছে। ভাঙা। এটা

দিয়েই আমার মাথায় আঘাত করেছিল মেয়েটা।

‘পুলিশকে খবর দিয়েছো নিশ্চয়ই?’ ফ্যাসফেসে স্বরে বলি

আমি।

‘নাহ, এখনো দিই নি।’ যেন মজার কোনো কথা বলছে এমন

ভঙ্গিতে কথা বলে উঠে মেয়েটা।

আমাকে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে দেখে তরল স্বরে মেয়েটা বলে, ‘তোমার সাথে প্রেমালাপ আগে শেষ করি, তারপর নাহয় পুলিশে খবর দেবোক্ষণ। এত তাড়া কিসের? আমার সাথে প্রেম করতে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই তোমার। খুব একটা খারাপ দেখতে নই আমি, তাই না? তখনতো দেখলাম চোখ দিয়ে বেশ গিলে গিলে খাছিলে আমার শরীরটাকে।’ নিজের রাসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠে সে।

মেয়েটা মিথ্যা বলছে, এটা সুনিশ্চিত। পুলিশে খবর না দেবার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না আমি। তারপরেও পুলিশ যেহেতু এখনো আসে নি। কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কন্টির কী ঘটেছে সেটাতো আর মেয়েটা জানে না। কাজেই কন্টি কার্ডটাই খেলতে হবে আমার। বাচ্চা মেয়েদেও যোভাবে বড়ো বোবায় সেভাবেই শুরু করি আমি।

‘শোনো মেয়ে, আমাকে মেরে বেঁধেছো সে জন্য কিছু মনে করি নি আমি। তোমাকেও বেঁধেছিলাম আমরা। কাজেই শোধবোধ।

এখন আমার বাঁধন খুলে দাও। ক্থা দিচ্ছি তোমাকে ছেড়ে দেবো আমি। কোনো ক্ষতি করবো না।’

‘এইতো কত মিষ্টি করে কথা বলছো তুমি। কী যে ভালো লাগছে আমার। বেঁধে রাখলেই অনেক রোমান্টিক তুমি। বাঁধনছাড়া তুমি অনেক রক্ষ।’ আবারো খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটা। এই মেয়ের মনে হয় হাসি রোগ আছে।

‘কন্টি উপরে বিশ্রাম নিচ্ছে। যে কোন সময়ই নিচে নেমে আসবে। ওর কাছে অস্ত্র আছে। তখন তুমি বিপদে পড়ে যাবে।’ ভয় দেখাই আমি।

‘ওরে বাপরে! তাইতো। কী করা যায় এখন?’ শরীরটাকে কুকড়ে কৃত্রিম ভয়ের ভান করে মেয়েটা। ওর গলার স্বর শুনেই বুবাতে পারি যে কন্টির কী ঘটেছে সেটা জানে এই মেয়েটা।

আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই উপরে গিয়েছিল সে। কৌশলে আর কাজ হবে না। কাজেই, সরাসরি খেলার দিকেই নজর দিই আমি।

‘পুলিশকে কেন খবর দাও নি?’ কী চাও তুমি? টাকা? আমরা কোনো টাকাই লুট করতে পারি নি ব্যাংক থেকে, সেটাতো তুমি নিজেই দেখেছো।

‘কে বললো টাকা চাই আমি? আমি নিজেই যথেষ্ট কামাই করি। তোমার মত ছিকে একটা চোরের কাছ থেকে কেন টাকা না নিলেও চলবে আমার।’ কঠোর স্বরে মেয়েটা বলে। এক নিমিষে মেয়েটার ব্যক্তিত্ব পালটে গিয়েছে। একটু আগের অসহায় পুতুপুতু মেয়েটা যে সামান্য সময়ের ব্যবধানে এতখানি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

বিশ্বাস হয়ে পড়ি আমি। আমাকে এরকমভাবে কজা করেও মেয়েটা কেন পুলিশে খবর দেয় নি, কিছুতেই বুবাতে পারছি না। পালানোর এত বড় সুযোগটা পেয়েও, কেন সে নেয় নি কে জানে? খুব সহজে আমার পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করে গাড়িটাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতো সে। বোকার মত জিজেস করি, ‘তবে কেন আটকে রেখেছো আমাকে? পুলিশে কেন খবর দাও নি? নিজেই বা পালাচ্ছো না কেন?’

টেবিল থেকে আমার ছুরিটাকে তুলে নেয় মেয়েটা। উলটে পালটে দেখেছে। বাটের উপরের বোতামটা টিপ দেয় সে। ছয় ইঞ্চির ধারালো ফলাটা বেরিয়ে আসে। আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেখানে। আগার দিকটা সামান্য কালচে হয়ে রয়েছে। কন্টির রক্তের দাগ পুরোপুরি মোছে নি। মুঝ দৃষ্টিতে ছুরিটাকে নেড়েচেড়ে দেখছে মেয়েটা। ‘বাহ! বেশ দারণতো ছুরিটা।’ আমার দিকে তাকিয়ে বলে। মুখে মিষ্টি হাসি।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটা। একটা পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়ায়। কঠিন স্বরে টেনে টেনে বলে, ‘আমি যেরকমভাবে আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমার কাছে কারুত্বমিনতি করেছিলাম, আমি চাই ঠিক সেরকমভাবে তুমিও তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমার কাছে কাকুত্বমিনতি কর।’

টেবিলের উপর রাখা মেয়েটার সুপুষ্ট লোমহীন নগ্ন পা বেয়ে ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি উঠে যেতে থাকে উপরের দিকে। পলকহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। সেই চোখে অন্তৃত একটা কাঠিন্য। অন্তৃত কিষ্ট অচেনা নয়। প্রতিদিন আয়নাতে এই চোখই দেখি আমি। শিউরে উঠে আমার শরীরটা। ভয়ের শীতল একটা হোত নেমে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে।

মেয়েদের চোখে এত কাঠিন্য থাকে কী করে?

ফরিদ আহমেদ, মুক্তমনা বগের মডারেটর এবং লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ - ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খেঁজে’ (অভিজিৎ রায়ের সাথে মিলে); অবসর, ২০০৭।